আমেরিকা থেকে মুহম্মদ জাফর ইকবাল

তথ্য, কমপিউটার এবং বাংলাদেশ

পৃথিবীতে তথ্য বিপ্লব শুরু হয়েছে। এই তথ্য হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর সম্পদ। এই প্রথম পৃথিবীতে একটা সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে যেটা তৈরী করতে কাঁচামালের প্রয়োজন নেই, শিল্পায়নের প্রয়োজন নেই, বিশাল মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন প্রায় মূল্যহীন কমপিউটার এবং কমপিউটার বিষয়ক জনশক্তি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে কিন্তু কমপিউটার বিষয়ক জনশক্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠতে পারবে না। সেটা গড়ে উঠতে পারে শুধু মাত্র জাতীয় পর্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

বাংলাদেশের মানুষ সেটা কি তার দেশের কাছে দাবী করতে পারে না?

১. তথ্য জগৎ

আমরা এখন একটা নুতন জগতে বাস করি। এই জগৎটি নুতন জন্ম নিয়েছে, ইংরেজীতে একে বলা হয় Information Age, বাংলায় কি বলা হবে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই, সম্ভবতঃ তথ্য জগৎ। জগৎটি সম্পর্কে পুরোপুরি কারো ধারণা নেই, সেটি কিভাবে কোনদিকে মোড় নেবে সেটা শুধু অনুমান করা যায় কিন্তু নিশ্চিত হয়ে কেউ কিছু বলতে পারে না। তবে এই জগৎটি সত্যি এসেছে এবং সারা পৃথিবীতে একটা বড় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। পরিবর্তনটি পুরোপুরি শুভ পরিবর্তন আমি সে রকম দাবী করবে। না, কিন্তু সেটা উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই।

তথ্য জগৎটি দানা বাঁধছে পাশ্চাত্য জগতে, কারণ এর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রযুক্তি বা টেকনোলজীর সাথে। টেকনোলজীর যে অংশ এর মাঝে সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছে সেটা হচ্ছে কমপিউটার। কয়েকটা উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে।

আমি যখন ক্যালিফোরনিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজীতে কাজ করি তখন সপ্তাহ কয়েকের জন্যে কোথায় জানি গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি যেখানে মোটামুটি অব্যবহৃত একটা পার্কিং লট ছিল সেখানে ছাত্রদের জন্যে পুরো একটা আবাসিক হল তৈরী হয়ে গেছে। এত দ্রুত যে এত বড় একটা কাজ হতে পারে সেটা বিশ্বাস হবার কথা নয়, কিন্তু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করি কেমন করে? আমি অবাক হয়েই আমার দায়িত্ব শেষ করেছিলাম, কিন্তু আমার এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু চোখে আংগুল দিয়ে আমাকে আরেকটা জিনিষ দেখালেন। বললেন, কেমন করে এত তাড়াতাড়ি করা হল জান? এই বাসাগুলি কাঠের, কাঠের প্রতিটি টুকরা কমপিউটার দিয়ে ডিজাইন করে মাপমত কাটা। মিস্ত্রি এসে একেবারে চোখ বুঁজে কাঠের টুকরাগুলি জুড়ে দেয়, বাসা দাড়িয়ে পড়ে।

উদাহরণটি কমপিউটারের চোখ ধাঁধানো ব্যবহারের উদাহরণ নয়, কিন্তু আমার প্রিয় উদাহরণ। আশ্চর্য অল্প সময়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে একটা কাজ করা সম্ভব হয়েছে। কারণ, কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যকে খুব যত্ন করে ব্যবহার করা হয়েছে। তার জন্যে প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর সেরা কমপিউটার আর সেরা ফন্ত্রপাতি ব্যবহার করেননি, কিছু সাধারণ মানুষ কিছু সাধারণ কমপিউটার এবং তার থেকেও সাধারণ কিছু যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছে, আর তার ফলে তৈরী হয়েছে কিছু সাধারণ কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ। অবিশ্বাস্য দক্ষতায়। রাতারাতি মানুষের কর্মদক্ষতা বেড়ে গেছে কয়েকগুণ!

এবারে একটা চোখ ধাঁধানো উদাহরণ দেয়া যাক। সমুদ্রোপকূলের একটা জাহাজ থেকে একটা টমাহক মিসাইল ছোড়া হল আকাশের দিকে, সেটা খানিকটা উপরে উঠে মাথা ঘুরিয়ে একটা নির্দিষ্ট দিকে ঘুরে গেল, তারপর সেটা ছোটা শুরু করল। মাটি থেকে অল্প একটু উপর দিয়ে সেটি ছুটছে, অবিশ্বাস্য গতিতে নয় কিন্তু অবিশ্বাস্য দক্ষতায়, পাহাড় এলে মিসাইলটিও উপরে উঠে যাচ্ছে, পাহাড় অতিক্রম করে মিসাইলটিও নীচে নেমে যাচ্ছে। শহর নগর অতিক্রম করে যাচ্ছে, রাজপথের উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে, প্রয়োজনে ঘুরে যাচ্ছে ডানে কিংবা বামে। শুধু তাই নয় আবাসিক হোটেল থেকে একবার কিছু সাংবাদিক দেখেছিল যে একটি টমাহক মিসাইল সোজা তাদের দিকে এসে হোটেলটিকে পাশ কাটিয়ে ঘুরে গিয়ে আঘাত করল সামরিক লক্ষ্য স্থলে। যেন কোন বুদ্ধিমান দক্ষ পাইলট বসে আছে এই টমাহক মিসাইলটিতে, সে জানে কখন কোথায় কি করতে হবে।

টমাহক মিসাইলে কোন মানুষ ছিল না, তার মাঝে ছিল শক্তিশালী কমপিউটার এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। উপগ্রহ থেকে এই এলাকার ছবি তুলে সেটাকে ডিজিটাইজ করে রেখে দেয়া হয়েছে কমপিউটারের মেমোরীতে অনেক আগে, টমাহক মিসাইলটি তার মেমোরীতে রাখা সেই ছবির সাথে মিলিয়ে মিলিয়ে ছুটে গেছে লক্ষ্যস্থলে, বুদ্ধিমান মানুষের দক্ষতায়। আশ্চর্য সেই চোখ ধাঁধানো দক্ষতা, দেখে মুগ্ধ হবে যে কোন মানুষ, যদি না সেই মিসাইলের লক্ষ্যস্থল হয় সে স্বয়ং। প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা, নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, মনুষত্বের চরম অবমাননা করা হয় বুদ্ধিমান কিছু যন্ত্র দিয়ে চোখের আড়ালে, হত্যাকারীর সামনে থাকে কমপিউটারের মনিটর, কিছু ছবি, কিছু সংখ্যা। যুদ্ধ এবং হত্যাকাণ্ডের মত বিভীষিকা মানুষের মনে দাগ কাটে না, কারণ সেটি আর হত্যাকাণ্ড নয়, সেটি একটি খেলা। তথ্যকে ব্যবহার করে সেই ধ্বংস ধ্বংস খেলা হয় নিরাপদ দূরত্ব থেকে।

আরেকটা ভিন্ন ধরণের উদাহরণ দেয়া যাক। সাউথ আফ্রিকার নেলসন মেণ্ডেলা তার প্রায় পুরো জীবন দক্ষিণ আফ্রিকার কারাগারে কাটিয়ে একদিন মুক্ত মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে বের হয়ে এলেন। কারণটা কি? সাউথ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠীর রাতারাতি শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে? তারা বুঝতে পেরেছে যাদের গায়ের রং কালো তাদেরকে মানুষের মর্যাদা না দেয়া পৃথিবীর সবচেয়ে হীনতম কাজগুলির একটি? না, সেটি মোটেও নয়, তার কারণটি অন্য জায়গায়। টেলিভিশনের কল্যাণে পৃথিবীর সব মানুষ জেনে গেছে সাউথ আফ্রিকা নামে একটি দেশে কালো রংয়ের মানুষকে মানুষ হিসেবে বিচার করা হয় না। সাধারণ মানুষ ঘৃণায় সে দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, শুধু তাই নয় বড় বড় কর্পোরেশনগুলিকে বাধ্য করল সাউথ আফ্রিকা থেকে তাদের পুঁজি সরিয়ে নিতে। কালো মানুষের শ্রমে তৈরী সাউথ আফ্রিকা নিজেদের আবিষ্কার করল একটা অর্থনৈতিক সংকটে। দীর্ঘকাল তারা অপাংতেয় হিসেবে কাটিয়ে এসেছে, অলিম্পিকে পর্যন্ত যোগ দিতে পারেনি, কিন্তু তাদের মাথা ব্যথা ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে কোন দেশ আর একা টিকে থাকতে পারে না। তাই আশীর দশকে যখন হঠাৎ করে সাউথ আফ্রিকা আবিষ্কার করল একটা অর্থনৈতিক সংকট, নেলসন মেণ্ডেলা বের হয়ে এলেন জেল থেকে মাথা উঁচু করে। শুরু হল জাতি বিভেদ দূর করার আয়োজন।

এটি আরেকটা তথ্য বিনিময়ের উদাহরণ আমরা তথ্য বলতে সাধারণতঃ যে জিনিষটি বুঝি সেই তথ্য। যে তথ্য দেখা যায়, বোঝা যায়, অনুভব করা যায় সেই তথ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে আজকের জগতে তথ্যের যে বিস্ফোরণ ঘটেছে তার সব কিন্তু এরকম তথ্য নয়, তার বড় অংশ আমাদের ধরা ছোয়ার বাইরে, এক কমপিউটার থেকে অন্য কমপিউটার, এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে সেটি ছুটে চলছে। মহাকাশযানের নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে ডেস্কটপ পাবলিশিং ব্যবহার করে একুশের বই মেলায় প্রকাশিত বইয়ের পিছনে রয়েছে সেই একই তথ্য, কম্পিউটারের সেই একই বিটস (bits)!

তথ্য, তথ্য আর তথ্য। পৃথিবীর এক মাথা থেকে অন্য মাথায়, এক কমপিউটার থেকে অন্য কমপিউটারে, এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে ছুটে চলছে সেই তথ্য, দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে। চোখের পলক ফেলতে যে সময় লাগে সেই সময়ে অপটিক্যাল ফাইবারের মাঝে দিয়ে দশ হাজারটি বইয়ের সমপরিমান তথ্য ছুটে যেতে পারে; সুপার কমপিউটারে লক্ষকোটিবার সেই তথ্যকে চুলচেরা হিসেবের মাঝে যাচাই করা যায়। তথ্য ব্যবহারের বিপ্লব হচ্ছে পৃথিবীতে। গত শতাব্দীতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউশান হয়ে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গিয়েছিল, মানুষের শ্রমের জায়গায় এসেছে যন্ত্র। যে জাতি যে দেশ সেই বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল পৃথিবী আজ সেই দেশ আর সেই জাতির মুঠোর মাঝে! যারা নেয়নি তারা নিজেদের সম্পদ, ঐশ্বর্য, নিয়ন্ত্রণ

এমন কি প্রতিভাবান জনশক্তিকে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছে তাদের হাতে।

এখন আবার দ্বিতীয় বিস্ফোরণ হচ্ছে পৃথিবীতে, তথ্য বিপ্লব। এক সময় যে কাজে ব্যবহার হত মানুষের শ্রম, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশানের পর সেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে যন্ত্র। ঠিক তেমনি তথ্য বিপ্লবের পর যেখানে একসময় ব্যবহৃত হত মানুষের মস্তিষ্ক সেখানে ব্যবহৃত হবে নতুন রকমের যন্ত্র— সাধারণ অর্থে যেটাকে বলা হয় কমপিউটার। যে জাতি, যে দেশ সেই তথ্য বিপ্লবে অংশ নেবে পরের শতাব্দীতে তারাই হয়তো পৃথিবীকে রাখবে হাতের মুঠোয়। আমরা এর মাঝে একবার সেটা ঘটতে দেখেছি, ইরাকের সাথে পাশ্চাত্য জগতের অসম যুদ্ধটি ছিল তথ্য যুদ্ধ—যে যুদ্ধটি করা হয়েছিল সফটওয়্যার দিয়ে।

হ্যাঁ, সফটওয়্যার দিয়ে। সে কারণে পাশ্চাত্য দেশের প্রতি একজন সৈনিকের প্রাণের বিনিময়ে নেয়া হয়েছে আনুমানিক এক হাজার ইরাকী সৈনিকের প্রাণ। এই ভয়ংকর অসম যুদ্ধ সম্ভব হয়েছে যে জিনিষটির জন্যে সেটি ছিল সফটওয়্যার।

২. হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার

এতক্ষণ যে কথাগুলি বলা হয়েছে সেগুলি খানিকটা আত্মিক, খানিকটা দার্শনিক এবং খানিকটা উচ্চমার্গের কথা। এবারে বাস্তব জগতে নেমে আসা যাক।

হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যার বলতে কি বোঝানো হয় সেটা আজকাল সবাই জানে, তবু পরিপূর্ণতার খাতিরে আরেকবার বলে নেয়া অযৌক্তিক নয়। হার্ডওয়্যার হচ্ছে কমপিউটার নামক যন্ত্রটি— মনিটর, কী বোর্ড, হার্ড ডিস্ক, ফ্লপি ডিস্ক, ডিস্ক ড্রাইভার এবং সর্বোপরি মাইক্রোপ্রসেসর এবং মেমোরীসহ মূল বোর্ডটি। সফটওয়্যার হচ্ছে কিছু তথ্য যেটা কমপিউটার এবং তার সাথে যুক্ত অন্য সব যন্ত্রপাতিকে কৌশলী একটি জিনিষে পরিণত করে দেয়। আরো সোজা কথায় বললে কমপিউটার হচ্ছে হার্ডওয়্যার, এবং তার প্রোগ্রাম হচ্ছে সফটওয়্যার। সফটওয়্যার হচ্ছে ধরা ছোয়ার বাইরের একটা জিনিষ, আমরা সেটা তৈরী করতে পারি, ফ্লপি ডিস্কে করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিতে পারি কিন্তু শুধুমাত্র কমপিউটারের হার্ডওয়্যারের মাঝেই এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়।

সাধারণ মানুষ, যারা আধুনিক কমপিউটারকে কাজ করতে দেখেননি, তারা প্রথমবার সেটি দেখে সাধারণতঃ বাক্যহারা হয়ে যান। জিনিষটি যে মানুষ মাথা খাটিয়ে বের করেছে সেটা পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস হতে চায় না। যারা কমপিউটার সম্পর্কে খানিকটা জানেন, তারা কমপিউটারের পুরো কৃতিত্বটুকু দেন কমপিউটারের হার্ডওয়্যারকে। নতুন মডেলের কমপিউটার, তাদের গতি, নতুন মাইক্রোপ্রসেসর, তাদের ক্ষমতা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা বর্তমান কালের ফ্যাশন। কিন্তু সফটওয়্যার নামক জিনিষ, যেটি কমপিউটারকে তার পরিপূর্ণ শক্তি নিয়ে বিকশিত হতে দিয়েছে সেটা তারা অনুভব করতে পারেন না। যে জিনিষ ধরা যায় না, ছোয়া যায় না সেই জিনিষের মূল্য দেয়া যায় কেমন করে?

কিন্তু এই বেলা কয়েকটা জিনিষ বলে নেয়া যাক, আমি নিশ্চিত অনেকের জন্যে ব্যাপারটা বিশ্বাস করা শক্ত হবে, কারণ আমি নিজে যখন প্রথমবার এটা শুনেছিলাম, ব্যাপারটা আমার পক্ষেও বিশ্বাস করা শক্ত ছিল। সেটা হচ্ছে, কমপিউটারের জগতে হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের মাঝে সহজ অংশটুকু হচ্ছে হার্ডওয়্যার।

যেহেতু সেটা সহজ সেটা তুলনামূলকভাবে স্বল্পমূল্যের।

ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক। আমাদের প্রচলিত ধারণা অত্যন্ত জটিল কাজ করার জন্যে দরকার সর্বাধুনিক কমপিউটার। একটা অত্যন্ত জটিল কাজের উদাহরণ নেয়া যাক। একটা মহাকাশান যেটি পুরো সৌরজগত পার হয়ে যাবে, শুধু তাই নয় গ্রহগুলির পাশ দিয়ে যাবার সময় তার সম্পর্কে তথ্য, তার ছবি তুলে পাঠাবে পৃথিবীতে। এর থেকে জটিল কাজ আর কি হতে পারে? সে রকম একটি মহাকাশযান হচ্ছে ভয়েজার-২। ভয়েজার-২ নামের সেই মহাকাশযান নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে যে কমপিউটার ব্যবহার করা হয়েছিল আমি আজকাল আমার ঘরে বসে চিঠি লেখার জন্যে তার থেকে বেশী ক্ষমতাশালী কমপিউটার ব্যবহার করি। আজকালকার কমপিউটারের তুলনায় প্রায় ছেলেমানুষী একটা কমপিউটার ভয়েজার-২ কে সঠিক গতিপথে নিয়ন্ত্রণ করে সৌরজগতের গ্রহগুলি সম্পর্কে যে জ্ঞান, যে অত্যাশ্চার্য ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যন্ত্র ব্যবহার করে এত বিপুল জ্ঞান সংগ্রহ করার আর কোন উদাহরণ নেই। ভয়েজার-২ এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যেতে দু এক বছর লেগে যেতো, সেই সময়টুকুতে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা বসে বসে ভয়েজার-২ এর সীমিত মেমোরীর কমপিউটারের জন্যে নূতন দক্ষ সফটওয়্যার লিখতেন, সেই সব সফটওয়্যার পৃথিবী থেকে ভয়েজার-২এ পাঠানো হত, সেই সব সফটওয়্যার কমপিউটারে লোড করা হত, কমপিউটার সেগুলি ব্যবহার করত, এবং অসাধ্য সাধন করতো। পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের দূরদৃষ্টি এবং সফটওয়্যারের কল্যাণে ভয়েজার -২ এর অভিযান স্বার্থক হওয়া সম্ভব হয়েছে। ভয়েজার-২ এর অবিশ্বাস্য সাফল্য হয়তো আমাদের চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় কমপিউটারের ব্যবহার হচ্ছে তার সফটওয়্যারের ব্যবহার।

অন্যদিকে কমপিউটারের হার্ডওয়্যারের প্রাণ হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর। সিলিকনের উপর লক্ষ লক্ষ ট্রানজিষ্টরকে ক্ষুদ্র জায়গায় একত্র করে তৈরী হয় দ্রুত থেকে দ্রুততম মাইক্রোপ্রসেসর। ফ্যাক্টরী থেকে একবারে বের হচ্ছে নানা ধরণের লক্ষ লক্ষ আইসি। মূল্য কমে আসছে দ্রুত। প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চারিদিকে, আজকের অসাধারণ মাইক্রোপ্রসেসর পাঁচ বছরের মাঝে টেকনোলজীর জগতে অচল হিসেব ধরে নিচ্ছে সবাই। অবিশ্বাস্য স্বল্পমূল্যে পাওয়া যাচ্ছে অবিশ্বাস্য ক্ষমতাশালী প্রসেসর, পাওয়া যাচ্ছে অবিশ্বাস্য সব কমপিউটার।

আর সফটওয়্যার? শুনে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, পৃথিবীর সেরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে, সেরা সেরা গবেষণাগারে তুখোর বুদ্ধিমান মানুষ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সফটওয়্যার নামক জিনিষটাকে বাগে আনতে। হাজার হাজার বিজ্ঞানী গবেষক এবং প্রোগ্রামার যুদ্ধ করে যাচ্ছেন দিবারাত্রি। সফটওয়্যার জিনিষটা তৈরী করা এত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সেটা তৈরী করার উপরেই একটা নূতন বিষয়ের জন্ম হয়েছে, যার নাম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং। গুছিয়ে কিভাবে জটিল সফটওয়্যার লেখা যায় সেটাই হচ্ছে এর প্রতিপাদ্য বিষয়।

হার্ডওয়্যার তুলনামূলকভাবে সহজ, এবং কমপিউটারের বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তার সফটওয়্যার, আমাদের জন্যে এই সত্যটার একটা উজ্জ্বল দিক রয়েছে। সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার শিল্পের প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র উন্নত দেশের জন্যে একচেটিয়া নয়, ইচ্ছে করলে সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশের মত দেশও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবে। এর জন্যে যে জিনিষটি প্রয়োজন সেটি হচ্ছে কমপিউটার, এবং কমপিউটার বিষয়ক অভিজ্ঞ জনশক্তি। কমপিউটার অত্যন্ত স্বল্পমূল্যের জিনিষ। ইচ্ছে থাকলে বাংলাদেশের মত দরিদ্র দেশও তার প্রয়োজন মেটানোর মত যতগুলি সম্ভব কমপিউটার কিনতে পারবে। তাছাড়া কমপিউটার শিল্পে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে, আগেকার অতিকায় বিশাল একটি কমপিউটারের জায়গায় আজকাল ছোট ছোট ওয়ার্ক ষ্টেশন জায়গা করে নিয়েছে। প্রয়োজনে নেটওয়ার্কিং করে সেগুলি একসাথে জুড়ে দেয়া হয়। সেগুলি কেনা, ব্যবহার করা আর সংরক্ষণের জন্যে বাড়াবাড়ি কোন পরিশ্রম নেই। কাজেই বাংলাদেশে সফটওয়্যার শিল্প গড়ে তোলার জন্যে সত্যিকার কোন বাধা নেই, এর জন্যে প্রয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ খুব কম, বাইরে থেকে বিনিয়োগ করতে হবে সে রকম কোন প্রয়োজনও নেই।

দ্বিতীয় যে জিনিষটি প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কমপিউটার বিষয়ক জনশক্তি। সেই জনশক্তি রাতারাতি তৈরী করা যাবে না। সেটা গড়ে তোলার জন্যে যা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কমপিউটারের ভিত্তিভূমি বা ইংরেজীতে Infrastructure।

৩. ভিত্তিভূমি :

এবারে একটা ভুল ভেঙ্গে দেয়া যাক। কেউ যদি মনে করে যে একটা ছোট পিসি জোগাড় করে ঘরে বসে সি প্লাস প্লাস ভাষায় প্রোগ্রাম করা শিখে নিয়েই বাইরের পৃথিবীর সাথে সফটওয়্যারের প্রতিযোগিতায় নেমে যাওয়া সম্ভব তাহলে সে খুব ভুল করবে। ঘরে বসে চমকপ্রদ প্রোগ্রাম লিখে সেটা দিয়ে অর্থোপার্জন করা হয়েছে সেরকম উদাহরণ নেই তা নয়। কিন্তু সেটি ঠিক উদাহরণ নয়, সেটি অর্থকষ্ট দূর করার জন্যে লটারীর টিকিট কেনার মত উদাহরণ। বাইরের পৃথিবীর সাথে সফটওয়্যার

শিল্পের প্রতিযোগিতায় নামার আগে দরকার কমপিউটারের একটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার। ঘরে বসে টুকটাক কমপিউটারের ব্যবহার আর কমপিউটারের ইনফ্রাস্ট্রাকচার এক জিনিষ নয়। সত্যিকার অর্থে কমপিউটার জগতে পা দেয়ার জন্যে যেটা দরকার সেটা হতে হবে অনেক ব্যাপক। সবার আগে গড়ে তুলতে হবে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার। এই মুহূর্তে সেটা গড়ে উঠতে পারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কমপিউটার সায়েন্স বিভাগ বা সে ধরণের কোন ইনষ্টিটিউটে। যেখানে ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক এবং গবেষকদের মাঝে কমপিউটার জগতের সেই জ্ঞানটুকু গড়ে উঠবে ধীরে ধীরে। স্থায়ী একটা আশ্রয় হবে সেই দুর্লভ জ্ঞানের। বাংলাদেশের অভিজ্ঞ জনশক্তির বড় একটা অংশ দেশের বাইরে রয়েছে। তাদের ছোট একটা অংশকে যদি সাময়িকভাবেও ব্যবহার করা যায়, অত্যন্ত দ্রুত গড়ে উঠবে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার। দেশপ্রেমিক সেই জনশক্তি সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে, তাদেরকে ডেকে দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

পৃথিবীর বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় কমপিউটার সায়েন্স বিভাগে নানা ধরণের কাজ হচ্ছে, তৈরী হচ্ছে চমকপ্রদ সফটওয়্যার, তৈরী হচ্ছে সফটওয়্যার তৈরী করার জন্যে আরো চমকপ্রদ সহায়ক সফটওয়্যার (Tool), অবিশ্বাস্য তাদের ক্ষমতা, অবিশ্বাস্য তাদের বৈচিত্র। শেখার জন্যে জানার জন্যে তাদের তুলনা নেই। যে সমস্ত সহায়ক সফটওয়্যার রয়েছে সেগুলি ব্যবহার করে অতি সহজে আজকাল কমপিউটারের নুতন একটা ভাষার জন্ম দেয়া যায়, তার জন্যে কাজ চালানোর উপযোগী একটা কম্পাইলার লিখে ফেলা যায়। চোখ ধাঁধানো গ্রাফিক্স তৈরী করা যায়, অপারেটিং সিষ্টেম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায়, জটিল ইলেকট্রনিক্সকে সিমুলেট করা যায়। আর সবচেয়ে বড় কথা এই সব অবিশ্বাস্য সফটওয়্যার ব্যবহারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, যার ইচ্ছে সে ব্যবহার করতে পারে। এগুলি কোন মূল্য দিয়ে কিনে আনতে হবে না।

জ্ঞান সাধনার দিক থেকে দেখলে এটি একটি আশ্চর্য সুযোগ। পদার্থ বিজ্ঞানের জটিল পরীক্ষা করার জন্যে একটা পার্টিকেল এক্সিলেটর অন্য দেশ থেকে তুলে আনার কথা কেউ কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত স্বল্পমূল্যের ওয়ার্ক ষ্টেশনে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সফটওয়্যার তুলে আনা যায়। এদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের গতবাধা অসম্পূর্ণ একটা শিক্ষায় সন্তুষ্ট থাকার প্রয়োজন নেই। তারা সর্বাধুনিক হার্ডওয়ারে অভিজ্ঞ হতে পারে, ফোরট্রান, প্যাস্কেল কিংবা সি এর পাশাপাশি অবজেক্ট অরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স এমন কি চমকপ্রদ নিউরাল নেটওয়ার্কে কাজ করতে পারে। ইউনিক্সের পাশাপাশি ডিষ্ট্রিবিউটেড কমপিউটারে গবেষণা করতে পারে, প্যারালাল কমপিউটারের নীতি নির্ধারণ করতে পারে। নেটওয়ার্কিং এ হাত পাকাতে পারে। এ সবের জন্যে খুব বেশী অর্থের প্রয়োজন নেই, যে জিনিষটার প্রয়োজন সেটা হচ্ছে সদিচ্ছার।

বাংলাদেশের একটা বিরাট জনশক্তি সাম্প্রতিককালে প্রাশ্চাত্য দেশে বসবাস করছে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে বাংলাদেশের বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়াররা বড় ধরণের অবদান রাখেননি। যত দিন যাচ্ছে তারা আরো গুরুত্বপূর্ণ পদে আসন নিচ্ছেন। তাদের অনেকে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে নানাধরণের কমপিউটার সংক্রান্ত কাজকর্ম শুরু করার কথা চিন্তা ভাবনা করছেন। দেশে কমপিউটার বিষয়ক একটা জনশক্তি তৈরী হয়ে থাকলে পুরো ব্যাপারটি ত্বরান্বিত হতে পারত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

৪. উপসংহার ঃ

পৃথিবীতে তথ্য বিপ্লব শুরু হয়েছে। এই তথ্য হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর সম্পদ। এই প্রথম পৃথিবীতে একটা সম্পদের সৃষ্টি হয়েছে যেটা তৈরী করতে কাঁচামালের প্রয়োজন নেই, শিল্পায়নের প্রয়োজন নেই, বিশাল মূলধন নিয়োগের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন প্রায় মূল্যহীন কমপিউটার এবং কমপিউটার বিষয়ক জনশক্তি। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে কিন্তু কমপিউটার বিষয়ক জনশক্তি ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে উঠতে পারবে না। সেটা গড়ে উঠতে পারে শুধু মাত্র জাতীয় পর্যায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায়।

বাংলাদেশের মানুষ সেটা কি তার দেশের কাছে দাবী করতে পারে না? ✱